এশিয়া প্রতিবেদন ৩৩৬

ঢাকা/ব্রাসেলস, ৪ জানুয়ারি ২০২৪

International Crisis Group www.crisisgroup.org

সারসংক্ষেপ

নির্বাচনের চেয়েও অধিকতর: বাংলাদেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা ভাঙা

গবেষণার প্রধান ফলাফল

নতুন কী? ৭ জানুয়ারির সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। কর্তৃত্ববাদ ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মধ্যে অনেকটাই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ওপর সরকারের দমন-পীড়ন ও বিরোধী দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের গ্রেপ্তার উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং বিরোধীদের নির্বাচন বর্জনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কেন এটা ঘটেছে? ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ ও ২০১৮ সালে নিজ তত্ত্বাবধানে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করে ক্ষমতায় তাঁর দলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে বেপরোয়া কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, বৈদেশিক সম্পর্কের পালাবদল এবং নতুন করে উজ্জীবিত বিরোধী দল আওয়ামী লীগের জন্য আরেকটি একতরফা নির্বাচন করা কঠিন করে তুলেছে।

কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? বিরোধীদের নির্বাচন বর্জন মানে ভোটার উপস্থিতি সম্ভবত কম হতে যাচ্ছে। ব্যালটে তেমন বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প না থাকায় অসন্তুষ্ট বাংলাদেশিরা রাজপথে নামছে এবং রাজনৈতিক সহিংসতার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর মধ্যেও দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দিতে পারে।

কী করা উচিত? যদিও জানুয়ারির নির্বাচন পিছিয়ে দিতে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উচিত ভোটের পর উভয়পক্ষ থেকে ছাড়ের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা কমাতে কাজ করা। বিদেশি অংশীদারদের উচিত তাদের এই লক্ষ্যে উৎসাহিত করা।

৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি মারাত্মক অচলাবস্থার মধ্যে আটকা পড়েছে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ (এএল) সরকার এবং বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং নির্বাচন তদারকির জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান সরকার প্রত্যাখ্যান করার পর বর্তমান সরকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে বিএনপি ও তার মিত্ররা ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। এর পরিবর্তে শেখ হাসিনা তাঁকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করার বিরোধীদের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা- পুলিশ, বিচার বিভাগ ও বেসামরিক প্রশাসনের ওপর থাকা নিজ নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে আসছেন। ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকায় একটি বড় সমাবেশের পর, যা সহিংসতায় রূপ নেয়, সরকার বিরোধী দলের বেশিরভাগ জ্যেষ্ঠ নেতাদের আটক করে এবং বিএনপিকে ভেঙে দেওয়াটা উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ছিল। এরপর আরেকটি ত্রুটিপূর্ণ ভোট বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তুলবে। যদিও এখন ভোট স্থগিত করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, সংকটের সমাধান এবং আরও অস্থিতিশীলতা রোধ করার লক্ষ্যে সরকার ও বিরোধীদের উচিত ভোটের পর আলোচনা শুরু করা।

২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বিরোধীদের দমিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন প্রশাসনে পরিণত হয়েছে। এমনকি ১৯৮০'র দশকের সামরিক শাসনকেও ছাড়িয়ে গেছে। দেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে পাওয়া উত্তরাধিকার এবং একটি শক্তিশালী দলীয় কাঠামো থাকায় তিনি ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে তাঁর সাফল্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সরকার এক দশকেরও বেশি সময় শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তাঁর তদারকিতে নিরাপত্তা বাহিনী ২০০০-এর দশকে উত্থান হওয়া জিহাদি গোষ্ঠীগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে। পুরোনো মিত্র ভারতসহ বিদেশি সমর্থন, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও, যারা "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

PREVENTING WAR. SHAPING PEACE.

লড়াইয়ে" আওয়ামী লীগকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার মনে করে এবং ২০১৭ সালে মিয়ানমারে দমন-পীড়ন থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসা প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে গ্রহণে তাদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়- এ বিষয়গুলোও শেখ হাসিনার সরকারকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকার আওয়ামী লীগের সংকল্প বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে অবক্ষয় সাধন করেছে। গত এক দশকে শেখ হাসিনা আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, নিরাপত্তা সংস্থা ও নির্বাচনী কর্তৃপক্ষসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ধরেছেন; অনুগতদের এসব জায়গায় বসিয়েছেন। তাঁর সরকার বিরোধী কর্মী, সুশীল সমাজের ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকদের ওপরও নিপীড়ন চালিয়ে আসছে। নিরাপত্তা বাহিনী কয়েক শ বলপূর্বক নিখোঁজ (গুম) এবং কয়েক হাজার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। আরও অনেক কর্মীকে অন্তহীন মামলায় আদালতে দৌড়াতে হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে নতুন কঠোর আইনে করা মামলাও।

শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনের জন্য তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ২০১১ সালের সংবিধানের সংশোধনীগুলো। এর মাধ্যমে ভোটের আগে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনকে পথ করে দিতে নির্বাচিত দলীয় সরকারগুলোকে সরে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয় বিধানগুলো বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই সংশোধনীর কারণে বিরোধী দল ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করে এবং ২০১৮ সালের ভোটে অংশ নেওয়ার সময় তারা কর্তৃপক্ষের হাতে ক্রমাগত দমন-পীড়নের সম্মুখীন হয়। এ নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ভর্তির ব্যাপক অভিযোগের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও তাঁর মিত্ররা ৯৬ শতাংশ আসনে জয়ী হয়। এই ভোট এভাবে সংসদের ভূমিকাকে শেখ হাসিনার নির্বাহী আদেশ কার্যত দ্বিমত ছাড়াই অনুমোদনে কুক্ষিগত করে ফেলে, যেখানে ২০১৪ সালে বিরোধী দলের নির্বাচন বয়কটের পর ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল।

গত নির্বাচনের পর থেকেই দেশে-বিদেশে অসন্তোষ বাড়ছে। অনেক বাংলাদেশি অভিযোগ করেন, পনের বছর ধরে তারা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। তারা তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। সরকারের জন্য আরও ক্ষতিকর হলো অর্থনীতির চাকচিক্য বন্ধ হয়ে গেছে; ২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ও উচ্চ মুল্যস্ফীতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে, যার ফলে অনেক নিম্ন-আয়ের শ্রমিককে জীবিকা উপার্জনে হিমশিম খেতে হচ্ছে। যদিও বাহ্যিক কিছু কারণ আংশিক ভূমিকা রেখেছে, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে বেঁধে দেওয়া মুদ্রাবিনিময় হার নীতির ফলে এই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো প্রকটতর হয়েছে। এদিকে ওয়াশিংটনে বাইডেন প্রশাসন মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত বাংলাদেশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে মনে করা কর্মকর্তাদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ভিসা আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এসব পদক্ষেপ বিরোধী দলকে জাগিয়ে তোলে, তারা ২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে অসংখ্য বড় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যা প্রায় এক দশকের মধ্যে প্রথম। তাদের ব্যর্থ করে দেওয়ার সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ২০২২ সালের ডিসেম্বর এবং ২০২৩ সালের জুলাই ও অক্টোবরে বড় সমাবেশগুলোতে লাখো সমর্থক অংশ নেয়। এ সমাবেশগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবরের সমাবেশটি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর পুলিশ টিয়ারগ্যাস ও স্টান গ্রেনেড দিয়ে উপস্থিত লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করে দিলে আগেভাগেই শেষ হয়ে যায়। রাস্তায় সংঘর্ষের সময় বিএনপির সমর্থকেরা একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। প্রতিক্রিয়ায় সরকার দলটির বেশিরভাগ জ্যেষ্ঠ নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং কারাগারে রিমান্ডে নেয়।

এসব ঘটনা দুই পক্ষের মধ্যে বৈরিতা আরও তীব্র করেছে। শেখ হাসিনা বিরোধী দলের সঙ্গে সংলাপ নাকচ করে দিয়েছেন। এদিকে বিএনপি ও তার মিত্ররা অর্থনীতিকে ব্যাহত করতে এবং সরকারকে তাদের নির্বাচনী দাবিতে রাজি হতে বাধ্য করতে হরতাল ও অবরোধের ডাক দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ নেতাদের দলত্যাগের প্রলোভন দিয়ে বিএনপিকে বিভক্তও করতে চেয়েছে আওয়ামী লীগ, যদিও খুব একটা সফল হয়নি। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী শক্তিগুলো একটি বৃহত্তর সরকারবিরোধী জোট গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, যেখানে সেসব দলও থাকছে, যারা আগে কখনো ছিল না।

বাংলাদেশ এখন এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। অপূর্ণ হলেও একসময়ের প্রাণবন্ত গণতন্ত্র শিগগির ক্ষমতাসীন সরকারের বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প ছাড়াই তৃতীয় নির্বাচন করবে। শেখ হাসিনার নিজের মতো করে নির্বাচন করার সংকল্প ভোটের আগে ও পরে সহিংসতার ঝুঁকি বাড়াবে। অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির পাশাপাশি দলটি যে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের একটি সমঝোতা চাওয়ার কারণ রয়েছে। যদিও শেখ হাসিনার দল স্বল্পমেয়াদে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে, বিরোধী দল নিজেদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে নিতে পারে। আর সম্ভাব্য সহিংস প্রতিক্রিয়াসহ আওয়ামী লীগের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়তে পারে। অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে দুই পক্ষকে সংলাপে বসতে হবে। প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক পুনর্গঠন এবং বাংলাদেশকে গণতন্ত্র, শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথে ফিরিয়ে আনতে আলোচনার জন্য উভয়পক্ষ থেকে ছাড় প্রয়োজন। দেশটির বিদেশি অংশীদারদের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের উচিত তাদের সেই দিকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করা।

ঢাকা/ব্রাসেলস, ৪ জানুয়ারি ২০২৪